নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ

নিবন্ধ

নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ
নিবন্ধ নিবন্ধ নিবন্ধ

বাংলাদেশের গাজীর গান

সাইমন জাকারিয়া

বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য পরিবেশনারীতির মধ্যে 'গাজীর গান' সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রায় সারা বাংলাদেশেই এই দেশজ পরিবেশনারীতিটি নিয়মিতভাবে অভিনীত বা মঞ্চস্থ হয়ে থাকলেও গাজীর গানের প্রসিদ্ধ এলাকা হচ্ছে খুলনা বিভাগের যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা ও ফরিদপুর অঞ্চল। এ ছাড়া গাজীর গানের অপর দুটি প্রসিদ্ধ এলাকা হচ্ছে– টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চল। সারাদেশেই গাজীর গানের অসংখ্য পেশাজীবী, আধা-পেশাজীবী গাজীর গানের শিল্পী ও দল রয়েছে। তারা প্রায় সারা বছরই বায়নার ভিত্তিতে সাধারণত মানতে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। অথচ সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় এই 'গাজীর গান' সম্পর্কে লেখা হয়েছে– **"গাজীর গান** গাজী পীরের বন্দনা ও মাহাত্ম্য গীতি। প্রধানত ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে এ গান এক সময় প্রচলিত ছিল। সন্তান লাভ, রোগব্যাধির উপশম, অধিক ফসল উৎপাদন, গো-জাতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এরূপ মনস্কামনা পূরণার্থে গাজীর গানের পালা দেওয়া হতো। এ উপলক্ষে আসর বসিয়ে কিছু লৌকিক আচারসহ গাজীর গান পরিবেশিত হতো। আসরে থাকতো <গাজীর পট>, যাতে কারবালার ময়দান, মক্কার কাবাগৃহ, কাশীর মন্দির ইত্যাদি পবিত্র স্থানসমূহ অঙ্কিত হতো। অনেক সময় এসব পট মাটির সরা বা পাতিলেও আঁকা হতো।

গানের দলে ঢোলক ও বাঁশিবাদক এবং ৪-৫ জন দোহার থাকত। দলনেতা গায়ে আলখাল্লা ও মাথায় পাগড়ি পরে একটি <আসা> দণ্ড (magic stick) অবিরাম দুলিয়ে দুলিয়ে এবং লম্বা পা ফেলে আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গাইত, আর দোহাররা

ভাই কালাবানকে ফকিরিবেশ সাজানোর আগে গাজীর তসবি দান- সোহরাব উদ্দিন ও সহশিল্পী

তা পুনরাবৃত্তি করত; মুহুর্মুহু বাদ্যের তালে তালে এ গান চলত।

মূল গায়েন প্রথমে বন্দনা গাইত: 'পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর। এদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর॥ ...তারপরে বন্দনা করি গাজী দয়াবান। উদ্দেশে জানায় ছালাম হেন্দু মোছলমান॥' এরপর গাজীর জন্মবৃত্তান্ত, দৈত্য-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ, রোগ-মহামারী ও নানা বিপদ-আপদের দুষ্ট আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ, অকুল সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পুণ্যবান ভক্ত সওদাগরের নৌকা রক্ষা এসব বর্ণনা করা হতো।

গাজী পীর মুসলমান হলেও অসাম্প্রদায়িক; হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর ভক্ত। গাজীর গানে সমাজের বিভিন্ন আচার-বিচার ও সমস্যা তুলে ধরা হতো। কোনো কোনো গানে দুগ্ধ-দধি ব্যবসায়ী গোয়ালার ঘরে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও গাজীকে না দেওয়ায় তার শাস্তি বর্ণিত হতো। অপর একটি গানে আছে, গাজী পীর জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করেছেন; এমনকি মামলা-মকদ্দমায় জয়ী হওয়ার আশ্বাসও আছে একটি গানে: 'গাজী বলে মোকদ্দমা ফতে হয়ে যাবে। তামাম বান্দারা মোর শান্তিতে থাকিবে॥' এরূপ গানে ধর্মীয় ও বৈষয়িক ভাবনা একাকার হয়ে গেছে। গান চলার সময় আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা তাদের মানতের টাকা-পয়সা গাজীর উদ্দেশে দান করে থাকে। বর্তমানে এ গানের প্রচলন নেই বললেই চলে।'

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে প্রায় সারা বাংলাদেশ জুড়েই যেখানে গাজীর অস্তিত্ব রয়েছে গ্রামীণ মানুষের প্রাণের আবেগে, সেখানে 'এ গান প্রচলিত ছিল' লেখা হবার পূর্ব-পশ্চাৎ ভেবে পাওয়া যায় না। আবার এ প্রসঙ্গে এও দুর্লক্ষ্য নয় যে 'বাংলাপিডিয়া'য় লিপিবদ্ধ 'গাজীর গান' পরিচিতিতে গাজীর গানের প্রধানতম এলাকা খুলনা অঞ্চলের নামেরই উল্লেখ করা হয় নি। আর গাজীর গানের 'আসরে থাকতো <গাজীর পট>, যাতে কারবালার ময়দান, মক্কার কাবাগৃহ, কাশীর মন্দির ইত্যাদি পবিত্র স্থানসমূহ অঙ্কিত হতো। অনেক সময় এসব পট মাটির সরা বা পাতিলেও আঁকা হতো।' এই তথ্যটির সূত্র কী বোঝার উপায় নাই। আসলে 'গাজীর পট' বা 'গাজীর পটগান' নামে ভিন্ন একটি পরিবেশনারীতির অস্তিত্ব এখনও বাংলাদেশের কোথাও কোথাও আছে। তবে গাজীর পটে কখনো কারবালা ময়দান বা মক্কার কাবাগৃহ অঙ্কিত হত কি না তা জানা যায় না, গাজীর পট সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে– প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁশের খণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলিয়ে গাজীর পট দেখানো হত। প্রায় একই দৈর্ঘ ও প্রায় ৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একখণ্ড বস্ত্রে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকত এবং বস্ত্রখণ্ডটিকে বাঁশের আগায় বেঁধে মানচিত্রের মতো করে মুড়িয়ে রাখা হত। বাঁশের গোড়াটিকে প্রথমে আড় করে একটু দূরে সরিয়ে রেখে উপরের ছবিগুলিকে প্রথমে দেখানো হত একখণ্ড ছোট ও সরু লাঠির সাহায্যে। গাজীর এই পটে সাধারণত গাজীর পিতা সেকান্দর বাদশার লড়ায়ের কাহিনী,

গাজীর সঙ্গে মটুক রাজার ও দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, সে যুদ্ধে গাজীর বিজয়, ব্যাঘ্রপৃষ্টে গাজীর যুদ্ধ যাত্রা এবং বাঘ কুমিরের যুদ্ধচিত্র অঙ্কিত থাকত। গাজীর পট মূলত ভিন্ন ধরনের একটি পরিবেশনারীতি অঙ্কিত চিত্রই সেখানে কাহিনীর প্রকাশক হয়ে ওঠে। আর গাজীর গান পূর্ণাঙ্গ নাট্যপরিবেশনারীতির নাম। এই গাজীর গান পরিবেশনারীতির পাশে কখনো কারবালার ময়দান বা মক্কার কাবাগৃহ অঙ্কিত গাজীর পট পাশে ঝুলিয়ে রাখার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ ও ভারতে বেশ কয়েকটি স্থানে পীর গাজী ও কালুর নামে আস্তানা এবং কোথাও মাজার বা সমাধিও রয়েছে। এসব স্থানে এখন প্রতি বছর এক একটি নির্দিষ্ট দিনে ওরশ-অনুষ্ঠানাদি বা গাজীর স্মরণোৎসব হয়ে থাকে। সেখানে অগণিত গাজীর ভক্ত ও শিল্পীদের সমাবেশ ঘটে। আমরা এবারে গাজীর কয়েকটি আস্তানার উল্লেখ করছি, যেমন– ভারতের চব্বিশ পরগণা জেলার খাড়ীগ্রামে গাজীপীরের আস্তানা বা দরগায় পীরের একটি দারুমূর্তি আছে। বগুড়ার কেল্লাকুশিতে গাজীপীরের আস্তানা আছে। সিলেটের বিশগাঁও বা গাজীপুরে গাজীপীরের দরগা চিহ্নিত করা যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গাজীপীরের দরগা আছে। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় কালুপীরের বহু দরগা আছে। আমি একবার ঝিনাইদহ জেলার বারোবাজারের বাদুড়গাছা গ্রামে অবস্থিত গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজারের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

মায়ের কাছ থেকে বিদায়ের দৃশ্যে কালাচান ও মায়ের চরিত্র

গাজী কালু চম্পাবতীর মাজারে

প্রতি বছর ফাল্গুনের শেষ বৃহস্পতিবার এই মাজারে গাজী-কালুর স্মরণ্যোৎসব হয়ে থাকে। গাজী-কালুর ভক্তিরসে সিক্ত ভক্তরা প্রায় সারাদেশ থেকে ওইদিন এখানে এসে থাকে।

একেবারে ছোটবেলায় গাজীর গানের আসরে আসরে এমন বন্দনাগীতে খনিয়ানগরের ঠিক পরপরই আমাদের ঝিনাইদহ জেলার বারোবাজারের নাম শুনে বেশ শিহরিত হয়েছিলাম। জেনেছিলাম বারোবাজারেই গাজী-কালু-চম্পাবতীর কবর-আজও গ্রামের গাজীভক্তদের তীর্থস্থান হয়ে আছে। রোগমুক্ত, সুন্দর আর বিপদমুক্ত জীবনের বাসনায় ভক্তকুল গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজারে গিয়ে ভক্তি-প্রণামী দেয়, নিঃসন্তানরা মানত করে টাকা-কড়ি, হাঁস-মুরগি; খাশি দেয় এবং গাজীর দরগার একমুঠো মাটি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ভক্তিরসে সে মাটি ভক্ষণের পর তাদের ঘরে সন্তান এলে তখন মানত শোধ দিতে গাজীর গানের আয়োজন করে তারা সুখ খুঁজে পায়। শুনেছি সারা দেশের গাজীর গানের শিল্পীরাও বছরের একটি দিনে বারোবাজারে গাজীর মাজারে যায়, সেটাই ফাল্গুনের শেষ বৃহস্পতিবার।

বহুদিন ধরে গ্রামে গ্রামে গাজীর গান শুনে আসলেও গাজীর মাজারে যাওয়া হয়নি, এই আফসোস এবং গাজীর গানের গায়েনদের অনেক দিনের দাবি মেটাতে এবার আমি বেশ সকালে কুষ্টিয়া থেকে রহমত রিজভীকে সঙ্গে করে ঝিনাইদহের বারোবাজারের বাদুরগাছা গ্রামের গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজার প্রাঙ্গণে হাজির হই। মাজার প্রাঙ্গণের পশ্চিম পাশে বসে তখন এক সাধক গান গাইছে :

ভাব দিয়ে ভাব নিলে পারে
সেই সে রাঙা চরণ পাই।
আমি ওই চরণের দাসের যোগ্য নয়॥
ভাব জানিনে প্রেম জানিনে
দাসী হতে তাই পারিনে...

এটা গাজীর মাজারে গেয়েছেন এক সাধক সাঁইজি লালনের গান। সাধকের সঙ্গে সুর-তাল সঙ্গত করছে তার হাতের ডুগি একতারা, আর পাশে বসা আরেক সাধুর হাতের মন্দিরা। সাধুর কণ্ঠে গানের ইঙ্গিতে বুঝে গেলাম-গাজীর মাজারে আমাকে ভাব দিয়ে ভাব নিতে হবে। কারণ এটা ভক্ত আর ভাবুকদেরই সম্মেলনস্থল। গ্রামের নারী-পুরুষরা মাজারে ঢুকছে ভক্তিরসে গাজী-কালু-চম্পাবতীর পাকা সমাধিতে প্রণাম করছে ষাষ্ঠাঙ্গে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আপনমনে মাজার জিয়ারত করছে। এসব দৃশ্য দেখে আমরা মাজারের আশপাশে ছড়িয়ে পড়লাম।

এটা একেবারে গহীন গ্রাম। এখানে খোলামেলা মাঠ, ধান কাটা হয়ে গেছে বেশ আগে, সেই মাঠের মধ্যেই মেলার আয়োজন। কেউ এসেছে জাদুকরী দাওয়াই বিক্রি করতে, কেউ এসেছে গায়েন ভাড়া করতে সাবান-ডিটারজেনের প্রচার-প্রসারের জন্য, কেউ ভাত-রুটির মোবাইল হোটেল নিয়ে আস্তানা গেড়েছে শুকনো পুকুরের ভেতর। এখানে পুকুরের আধিক্য একটু বেশি। মাজারের পাশ ঘেঁষে পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ তিন দিকেই তিনটি পুকুর। উত্তরের পুকুরটা বেশ বড়, পুকুরটার মাঝখানে বর্গাকারে মাটি বাঁধানো পানিঘেরা একটি দ্বীপের মতো ভূ-ভাগ আছে, সেখানে যাওয়ার জন্য মাজার থেকে একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে এবারে নাকি গানের যত আয়োজন সব ওই দ্বীপটিতেই। যেতে হলে সাঁকোর জন্য দুই টাকার সেলামি দিয়ে যেতে হবে। তীব্র ইচ্ছের কাছে দু টাকা তো সামান্যই। আমরা সাঁকো পেরিয়ে পুকুরের পানি-ঘেরা দ্বীপে পা রাখলাম। আমার খুব মনে হলো-'জামালেরই ভাগ্য ভালো শ্রীরাম রাজার বর পা'লো, ওরে জুড়াদিঘি করিলেন হাজত।' এই কি সেই জুড়াদিঘি হাজত, মানে সেকালের কারাগার। পানি দিয়ে ঘেরা বিচ্ছিন্ন একটি ভূ-খণ্ড। হতেও তো পারে! সেখানে আজ সামিয়ানা টানিয়ে গানের ছোট ছোট আসর হবে। আমরা সকালেই এসে গেছি বলে গানের দলের লোকদের আসর সাজানোর আয়োজনের সঙ্গে অল্প-স্বল্প কথা বলে নিলাম।

একপাশের সব থেকে বড় সামিনায়া এখানে নাকি হিজড়াদের দল এসে নাচবে-গাইবে, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে আমরা অপেক্ষার আগেই হারমোনিয়াম মাস্টার দুলাল কর্মকারের গান শুনলাম। যশোরের ঝিকরগাছা থেকে গাজীর টানে গরম লোহার পিঠে হাতুড়ি পেটানো ফেলে তিনি গানের সুর ধরতে এসেছেন এই মাজারে, গান গাওয়ার মধ্যে এ কথাটি বলে তিনি যেন খুব সুখ পেলেন, আরো সুখ পেলেন নিজের কন্যাদের গানের সুরে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন উচ্চারণে। দুলাল কর্মকার আমাদের প্যান্ট-শার্ট পরা দেখে শিক্ষিত ভেবে লালন সাঁইজির গানের সঙ্গে একটি নজরুলসঙ্গীতও গেয়ে শোনালেন- 'ও ভাই খাঁটি সুনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি...।' তার গানের মাঝে 'সোনা' শব্দটির উচ্চারণ 'সুনা' হয়ে আমার মন-কানে যেন মধু ঢেলে দিল, আমার দৃষ্টিসীমা পুকুরের দ্বীপ আর ওপারের মাঠ পেরিয়ে বহু বহুদূর চলে গেল। আমি জানলাম-'এই দেশেরই আচার দেখে সভ্য হলো নিখিল ভুবন, দিব্য পরিপাটি।' আমার আর ভয় কি, এই মহান দেশে জন্ম নিয়ে!

ভাবতে ভাবতে আমরা পুকুরঘেরা দ্বীপ থেকে আবার গাজীর মাজার প্রাঙ্গণে ফিরে আসি। দক্ষিণের পুকুর পাড়ে গাজীর 'আশা' পোতা একটা আস্তানা দেখে ছুটে গেলাম-এরা নিশ্চয় গাজীর গানের গায়েন। কথা বলে জানা গেল, 'আশা'র মালিক চিশতিয়া তরিকার ভক্ত সৈয়দ আলাউদ্দিন চিশতি। তিনি গায়েন নন, পীর গাজীর আশেক। সেখান থেকে ফেরার পথে স্থানীয় দুই তরুণ রাজু ও ঝন্টুর সঙ্গে পরিচয়। ওরা গাজীর আশেক, কবিতা লেখার গুণে গুণী, ওদের সঙ্গে খাতির হতে বেশি সময় লাগল না, ওদের কৃপায় ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা ভাড়া করার একটা রাস্তা পাওয়া গেল, না হলে এ লেখার সুযোগটা আমি নিতাম না।

মাজারে ভক্তদের সার বেঁধে সেজে-গুঁজে আগমন দেখে দেখে সন্ধ্যা হয়ে এল। মাইকে মাইকে গানের সুর বেজে উঠতে থাকল। প্রথম গান মাজার স্থানকে নিয়ে-'বাদুড়গাছা গাজী-কালু-চম্পাবতীর দেশ। ছায়াঘেরা এক পল্লী পরিবেশ।' গানের এমন বর্ণনার মধ্যে পাশের

আরেকটি মাইক থেকে হিজড়াদের গীতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে- 'যাব লো সই তোদের পাড়ায় পাখা বেচিতে/আমার পাখার এমনি গুণ হাওয়া লাগে চতুর্গুণ/কত বাপ ও ভাইয়ের মন টলে যায় পাখার হাওয়াতে।' কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের আনন্দ অভিব্যক্তিময় গানের আসর দেখে আমরা সন্ধ্যার পর মাজারের অগুনতি ভক্ত সমাবেশের মধ্যে ভিন্ন ধরনের একটি 'গাজীর আশা' আবিষ্কার করি। 'গাজীর আশা' মূলত পিতলের তৈরি গোলাকার হয়ে থাকে, যার মধ্যে দুদিকে দুটি চন্দ্রাকার শূন্য স্থান দেখা যায়। কিন্তু আজকের এই অন্যরকম আশাটার গড়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এতে অনেকটা ত্রিশূলের মতো তিনটা মাথা আছে, কিন্তু তা কিছুতেই ত্রিশূলের মতো সরু ও চোখা নয়, অনেকটা মনুষ্যমস্তকাকৃতির, মাঝখানের মাথাটি একটু বেশি উঁচু, দু পাশের মাথা দুটি অপেক্ষাকৃত একটু ছোট। এ 'আশা'র লাঠিটাও একটু বেশি উঁচু। পাশাপাশি প্রচলিত আরেকটি 'আশা'ও পোতা আছে। আমি এরকম 'আশা' সামনে নিয়ে বসা ভক্ত-গায়েনদের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারা দাবি করলেন এটাই নাকি স্বয়ং গাজীর হাতের আশা। এই আশাপ্রাপ্তি নিয়ে তারা একটি গল্পও আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

হরিণাকুণ্ড থানার দৌলতপুর গ্রামের গায়েন আবুল হোসেন (৫৫) চারপুরুষ ধরে গাজীর এই আসল 'আশা'টির অধিকারী। আবুল হোসেনরা পাঁচ ভাই, সবাই পেশাজীবী গাজীর গানের শিল্পী। তার পিতা সবদ আলী মণ্ডলের কাছ থেকে আবুল হোসেন এই আশার অধিকারী হয়েছেন। তার পিতা 'আশা'টি পেয়েছিলেন দাদা তোরাপ মণ্ডলের কাছ থেকে, তিনি পেয়েছিলেন আবুলের পোটদাদা আনন্দ মণ্ডলের হাত থেকে। পারিবারিকভাবে 'আশা'র অধিকারী হয়ে তার পূর্বপুরুষরাও সবাই গাজীর গানের গায়েন ছিলেন। আবুল হোসেন এই আশাটি নিয়ে বলেন, 'এই আশা সম্বন্ধে আমরা গান গাতি গাতি যতটুকু জানি তা কচ্ছি, শোনেন- এইটা পাছলো সন্ধ্যের গায়েন। উনার বাড়ি ছিল ঝিনেদার সাধুহাটি ইউনিয়নের মামুদপুর খাড়াগুদা গ্রামে। উনি ছেলেন গরুর রাখাল। প্রতিদিন মাইসর নদীর চরে গরু রাখতেন, আর একা একা এই গাজীর গান করতেন, আর ওইদিকি গরু ঘাস খাইত। একদিন গান গাতি গাতি এক গাছতলা ঘুমা গেলি গাজী স্বপ্নে তারে কয়-'তুমি তো দিওয়ানা হওয়া গেছ, তুমি আর খালি গলায় গান গাবা না, ওই নদীর ধারে যায়ে না'মে দেকো, সব তুমি পাবা।' উনি ঘোমেরতে তড়াশ করে উঠে নদীর ধারে গেলেন। নদীর পানির মুদি নামে সব পালেন-এই হলো হারমোনিয়াম, আশা, চামর, সমস্ত কিছু। আমরা যেইডা শুনিছি সেইডাই আপনের কলাম। ...জানেন একবার... 'আশা'র নিচেডা ভাঙা দেখছেন না? এই 'আশা' এইরম নষ্ট হয়া গিলি। নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে ওই ঠ্যাঙ হইল গো জুত করতি কামার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হইল। কামার ওই হাতুড়ি উচোই করে ছিল, আর নিচে নামাতি পারিল না। তারপর কইল যে, আমার কুনু যা'গা লাগবে না, যে অবস্থায় আছি এই অবস্থায় থাকব।' কথিত এই 'গাজীর আশা'র অধিকারী আবুল হোসেনের দল মাসের অধিকাংশ সময়ই বায়না ও মানতে গান করে থাকে। গানই তাদের পেশা। মাজারে ঘুরতে ঘুরতে এরকম আরো অনেক গায়েনের সঙ্গে পরিচয় ও কথা হয়। গাজীর গানের ছুকরিদেরও কেউ কেউ সাজ-গোঁজ করে মাজারে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে সে রকম এক ছুকরি তালেবের কথা হয়, ওর বাড়ি শৈলকূপা থানায়।

সারা রাত উৎসব আমেজের পর শেষ রাতে পুরো মাজার জুড়ে গাজীর গানের ছোট ছোট আসর বসে। এসব আসরে শুধু দর্শক পাওয়া কিংবা বায়না পাওয়ার প্রতি গায়েনদের তেমন লক্ষ্য থাকে না, পীরগাজীর প্রতি নির্ভেজাল ভক্তি নিবেদনই তখন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছর পীর গাজীর গান

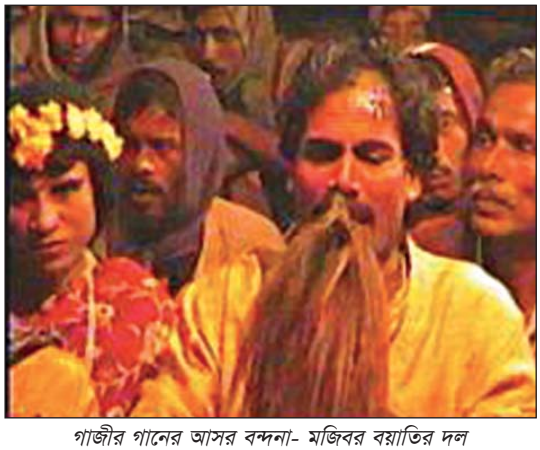

গাজীর গানের আসর বন্দনা- মজিবর বয়াতির দল

গেয়েই তাদের সংসার ও পেট চলে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। তাই, সে পীরের দরগায় এসে এইদিনে তাদের ভক্তিরসটা ঝরে পড়ে নির্মল পবিত্রতায়।

আর আমি ভাবি বসে মনে মনে, পীর গাজীর মাজারে এসে কি করে হিন্দু, মুসলিম, লালনপন্থি সাধু, চিশতিয়া তরিকার ভক্ত, হিজড়া এবং গ্রামের সর্বসাধারণ এক হয়ে যায়? কোন ভক্তিরসে তারা গায়-প্রাণে প্রাণে একই সঙ্গে-'পদছায়া দাও মাগো জগৎ-জননী, অধম সন্তানে ডাকি ভজন না জানি।' অথবা 'যদি এসে থাকো দয়াল তরাতে কাঙ্গাল আমারে নিও পার করিয়া/আমি নামাজ তো পড়ি না, রোজা তো রাখি না, ডাকব কী নাম ধরিয়া।' এই বাংলার প্রাণ তবে যুগল সাধনে, ধর্ম বা দেহে।

এতো গেল গাজী-পীরের মাজারের কথা, এবার আসছি আমার দেখা গাজীর গানের কথাতে। আগেই উল্লেখ করেছি– আমার গাজীর গান দেখার অভিজ্ঞতা একেবারে ছোটবেলা থেকে। ঝিনাইদহ জেলাতে আমার পৈতৃক নিবাস সেই সূত্রে এই জেলার গাজীর গান দলের পরিবেশনা দেখার অভিজ্ঞতাটা ছোটবেলা থেকেই হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার গাজীর গানের দলের পরিবেশনাও দেখেছি কম বেশি। এছাড়া, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গাজীর পালার আসরে উপস্থিত থাকতে পেরেছি। এ পর্যায়ে আমার দেখা গাজীর গানের দলগুলোর পরিচিতি তুলে ধরছি।

গাজীর গানের আমার দেখা দলগুলো হচ্ছে– ১. ঝড়ু বয়াতী, জুড়াদহ-ভায়না, হরিণাকুণ্ডু থানা, ঝিনাইদহ, ২. মজিবর বয়াতী, মাহমুদপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, ৩. রওশন জোয়ার্দার, দুধসর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, ৪. শরিফুল বয়াতী, কোর্টপাড়া, ঝিনাইদহ সদর, ৫. সোহরাব উদ্দিন, আবদালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ৬. লিয়াকত আলী সরকার বা লিয়াকত বয়াতী, মির দেওহাটা, চরপাড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ৭. ওয়াহেদ আলী, কবিরপুর, বাষার, ঢাকা।

এছাড়া, সারা বাংলাদেশে ভ্রমণসূত্রে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী অঞ্চলে প্রায় নিয়মিতভাবে গাজীর গান পরিবেশিত হয়ে থাকে বলে তথ্য পেয়েছি। গাজীর গানের অধিকাংশ দলই পেশাজীবীর ভিত্তিতে বায়না নিয়ে থাকে এবং পরিবেশনার জন্যে সারা বছরই প্রায় ব্যস্ত থাকে। তাদের কেউ কেউ আবার আধা-পেশাজীবীর ভিত্তিতে গাজীর গানের পালা করে থাকে। এই ধরনের দল গায়েন, বাদ্যকর, দোহারগণ গান পরিবেশনার পাশাপাশি কৃষিকাজ বা ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

স্থান ভেদে গাজীর গান পরিবেশনার রকমফের দেখা যায়। যেমন, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া অঞ্চলের গাজীর গান মূলত পুরুষ গায়েনদের পরিবেশনা, তাদের পরিবেশনাতে নারীর ভূমিকাতে পুরুষেরাই ছুকরি সেজে অভিনয় ও নৃত্যগীত করে থাকে, এঅঞ্চলের গাজীর গানের বিশেষত্ব হচ্ছে– পরিবেশনাটি হয় নাট্য আঙ্গিকে– বর্ণনাত্মক গীত ও গদ্য, গীত ও গদ্য সংলাপ এবং আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের সমন্বয়ে। অন্যদিকে, যশোর অঞ্চলের গাজীর গানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একসঙ্গে গাজীর গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। অপর দিকে, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গাজীর গানে কোনো পুরুষকে যেমন ছুকরি সাজতে দেখা যায় না, তদ্রূপ কোনো নারীরও প্রয়োজন পড়ে না, এক্ষেত্রে গায়েন একা একাই সমগ্র পরিবেশনা সম্ভব করেন, তবে, তার পিছনে বসা বাদ্যকর দোহারদেরকে সঙ্গীতাংশে বাদ্যবাদন ও দোহারকি করতে দেখা যায়।

গাজীর গানের ফোক্‌রে পালা

আমাদের বাড়িতে গাজীর গানের আসর বসত প্রতি বছর বেশ ঘটা করে। এটা দেখছিলাম বোধ-বুদ্ধি হবার আগ থেকেই। এখনও গাজীর গানের প্রধান দুই চরিত্র গাজী

কালুর নামে আমাদের দুই চাচাতো ভাই আছে। আবার একই বাড়িতে প্রতি বছর একই আসর আয়োজনের কারণ কী? খোঁজ নিয়ে জানতে পারি নুয়াচাচার বিয়ের পর আমার দাদীর নিয়ত ছিল- তার এই ছেলেটির যদি পর পর দুটি ছেলে সন্তান হয় তাহলে তাদের নাম রাখবেন গাজী-কালু আর প্রতি বছর বাড়িতে বসাবেন গাজীর গানের আসর। জিন্দাপীর শাহ গাজীর কৃপায় দাদীর নিয়তমতো ঠিক ঠিক নুয়াচাচার ঘরে এলো দুই-দুইটি পুত্র সন্তান। তাদেরই দুই ভাইয়ের নাম গাজী-কালু। তারপর দাদীর তদবিরে শুরু হলো গাজীর গান। দাদীর মৃত্যুর পর সেই রীতি ধরে রাখলেন নুয়াচাচা। এক পর্যায়ে নুয়াচাচা নতুন বাড়ি করলেন কালীনদীর ওপারে রতিডাঙ্গা গ্রামে। আমাদের বাড়ির গাজীর গানের আসরটিও বসন্তপুর থেকে রতিডাঙ্গা চলে গেল। আমিও ততদিনে গ্রামের স্কুল বদলেছি। তবু চাচার বাড়ি গাজীর গানের সংবাদ পেলেই মাইলের পর মাইল বাইসাইকেলে চেপে হোস্টেল থেকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি এসে পৌঁছি। রাতের খাবার শেষে মা আমার আগ্রহে নদী পার করে দেন, সঙ্গে দেন আরেকজন সাথী আর হারিকেন। নদীর চর দিয়ে অন্ধকার আলো করে হাঁটতে হাটতে আমরা আবার নুয়াচাচার আয়োজনের গাজীর গানের আসরে পৌঁছি। সারারাত আসর উপভোগে প্রভাতের মৃদু আলোয় পুব পাড়ার বাঁশের সাঁকো পার হয়ে বাড়ি ফিরি। গাজীর গানের সঙ্গে আমার প্রথম পর্বের সাক্ষাৎ এরূপেই হতো। তারপর কেটে যায় অনেক বছর। এ বছর আবার নতুনভাবে গাজীর গান দেখার কথা ভাবি। বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখি নুয়াচাচার মৃত্যুর পর গাজীর গানের সেই আসর থেমে গেছে। তবে আমাদের এলাকার দলগুলো এখনো নিয়মিত গাজীর গান পরিবেশন করে থাকে। কাজেই গাজীর গানের একটি দলের শরণাপন্ন হতে চেষ্টা করি। যাই ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার দুধসর গ্রামে গাজীর গানের একজন মূল গায়েন রওশন আলী জোয়ারদারের বাড়ি। গানের কারণে রওশন আলীর বাড়ি ফেরার সময় কম-মাসের ২৫ দিনই তাদের গানের বায়না থাকে। কাজেই বাড়িতে তাকে পাই না। তার অনুপস্থিতিতে তার ভাতিজার সঙ্গে কথা বলে মূল গায়েনের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র খুঁজি এবং পেয়ে যাই ভাটই বাজারে দল মালিক ভোলার ঠিকানা। দুধসর থেকে ভ্যানযোগে চানপুর বাসস্ট্যান্ড এসে নছিমনে চড়ে ভাটই বাজারে ভোলার দোকান খুঁজি। তিনিও দোকানে নাই। একজন তার পুত্রের দোকান দেখিয়ে দিতেই সেখানে যেয়ে দল মালিক ভোলার দর্জিপুত্র জহুরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জহুরুল বাবার গানবাজনা পছন্দ করেন না। কেন করেন না? এই প্রশ্নে তিনি গানপাগলা পিতার খামখেয়ালি, অধিক অর্থব্যয় এবং সামাজিক অবস্থার কথা বলেন। আমি তার কথার জবাবে পালাগান শিল্পীদের গুণপনার কথা বলি-মহৎ ব্যক্তি হিসেবে তার পিতার স্বীকৃতি দাবি করি। এতে আমার ভাগ্যে চা-বিস্কুট জুটে যায়। জহুরুল আমাকে তার বাড়িতে যাবার ব্যবস্থাও করে দেয়। জহুরুলের এক ব্যবসায়ী বন্ধুর মটর সাইকেলের পেছনে চেপে দুধসর চরপাড়া ভোলার বাড়ি প্রাঙ্গণে পৌঁছে ছোট এক মুদি দোকানের সামনে একটি মাঝারি গোছের মানুষকে বাইসাইকেলের সেবা দিতে দেখি। তিনি উঠে এসে আমাদের মুখোমুখি হন-হ্যাঁ, তিনিই দল মালিক ভোলা। তাকে বোঝাতে হয় আমি কোনো এনজিওকর্মী নই, সামান্য একজন শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষক। শিক্ষা নিচ্ছি গ্রামে ঘুরে ঘুরে-তাদের মতো মহৎ সব গায়েন পালাকারদের কাছ থেকে। তারাই আমাদের আসল শিক্ষক-গুরু। কথা হয়, বায়না নিয়ে গান দেখার সাধ্য আমাদের নাই-আমরা বরং তাদের কোনো মানত বা বায়না পরিবেশনা থাকলে, তার সংবাদ জানতে পারলে সেখানে নিজে থেকেই উপস্থিত হতে পারব। কথামতো আমাদের সুবিধামতো পরের মাসের শেষে

গাজীর গানের অভিনয়ে ছুকরি রবিউল ও কালু চরিত্রে হবিবর

আমরা আবার দল মালিক ভোলার বাড়িতে উপস্থিত হই-জানতে পারি, দুই দিন পর কালীগঞ্জ থানায় তাদের একটি বিশেষ বায়না আছে-সেখানে আমরা যেতে পারি। তার কথামতো আমরা সেই আসরেই যাই। এই লেখাটি মূলত সেই আসরকেন্দ্রিক।

আসরটি হয় কালীগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুলমাঠে ছোট শামিয়ানা টাঙিয়ে পাশাপাশি তিনটি পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। শামিয়ানার নিচে বিছানো বর্গাকার পাটিতে গাজীর গানের গায়েন ও বাদ্যকারগণ উত্তরমুখো হয়ে বসে গেলে মূল গায়েন আসরের উত্তরে 'গাজীর আশা' পুঁতে দিতেই বাদ্য বেজে ওঠে। বাদ্যের মধ্যে থাকে বাঁশি, হারমোনিয়াম, জুড়ি বা মন্দিরা এবং ঢোল। সমন্বিত বাদ্য শেষে মূল গায়েন একটি ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তার গানের সঙ্গে দোয়ারকি করেন পালার সকল গায়েন।

যদি এসে থাকো দয়াল তরাতে কাঙ্গাল
(দয়াল) আমারে নিও পার করিয়া ॥

(আমি) নামাজ তো পরি না রোজা তো রাখি না
পার করে দাও দয়া করিয়া ॥
... ...
(আমি) ভবেতে আসিয়া মায়াজালে পড়িয়া
গিয়াছি তোমাকে ভুলিয়া ॥...

ভক্তিমূলক এই গানটির পরপরই শুরু হয় আসর বন্দনা :

বন্দনা শেষে আসরে ওঠে দাঁড়ায় গাজীর গানের ছুকরীদ্বয়। তারা উঠে দাঁড়াতেই আসরের ভেতর থেকে গায়েনদের একজন বলে ওঠে-

: পাগলী, মুখে মিষ্টি হাসি, বসন্তের সুর, কাঁচা সুরের গান হবে কিন্তু, মানুষকে বুঝিয়ে দিও কিন্তু...।

সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের তালে তালে গানের সুর ধরে ছুকরীদ্বয় নাচতে শুরু করে। এই নাচ-গান দর্শকদের আনন্দদানের জন্য। আর এই কথাটি ছুকরীরা উঠে দাঁড়াতেই গায়েন একজন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ছুকরীরা গায়েনের সেই কথাটিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দর্শকদের বুঝিয়ে দেয় নাচ কাকে বলে! এখানে উল্লেখ করার বিষয় গাজীর গানের আসর সম্পর্কে অত্র এলাকার মানুষের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব আছে। তাদের কথা গাজীর গান অশ্লীল! তাদের কারো কারো কাছে একবার প্রশ্ন তুলেছিলাম, কেন গাজীর গান খারাপ? তারা উত্তর দিয়েছিল গাজীর গানে অনেক খারাপ কথা বলা হয়, অশ্লীল ইঙ্গিত করা হয়। আমি বিনয়ে জবাব করি, ভালোমন্দের বিচার যদি শুধুই আমার চোখ বা আমার অবস্থান থেকে করি তাহলে একটা মস্তবড় ভুল হতে পারে। কারণ আমি যাদের সঙ্গে চলি, কথা বলি তারা এক অবস্থানের আর ওরা অর্থাৎ যারা এই গাজীর গান করছে তারা আরেক অবস্থানের। আমি লেখাপড়া জানি, ওরা জানে না। ওদের কারো নিজের জমিজাতি পর্যন্ত নেই। হয় ওরা কামলা খাটে, নয় ওরা ছোটখাটো পুঁজির ব্যবসা করে অথবা এই গানই ওদের জীবিকা। তবে কোন চোখে আমি ওদের বিচার করবো? সে কি আমার চোখে? নাকি ওদের চোখেই ওদের বিচার করা সঙ্গত? যদি আমার চোখে করি তবে দেখবো আমি ছাড়া জগতে অনেক কিছুই অসঙ্গত, আর যদি গাজীর গানের দর্শক-শ্রোতা এবং গায়েনদের কথা বিবেচনায় রেখে গাজীর গানকে বিচার করি তাহলেও কি গাজীর গানকে খারাপ কিছু অথবা অশ্লীল বলে মনে হবে? ভালোমন্দের জ্ঞান সবার মনেই আছে-গাজীর গানের গায়েন-দর্শক-শ্রোতা এবং আয়োজক বা মানতকারীদের কাছে গাজীর গান যেমন উপভোগের বিষয়, তেমনিই ভক্তিরও বিষয়। তবে ভক্তির ক্ষেত্রও সবস্থানে, সবার কাছে এক রকম নয়-কেউ ভক্তি করে মনে মনে প্রার্থনায়, কেউ ভক্তি করে পূজা দিয়ে, কেউ করে মানত,

আবার কেউ অন্যভাবেও ভক্তি দেখাতে পারে। গাজীর গানের সহাস্য কৌতুক রসিকতা যতই শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করুক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত পরম ভক্তির।

মোট সাতটি পালা আছে গাজীর গানে। যথা : (১) বিয়ের পালা, (২) দিদার বাদশার পালা, (৩) ধর্ম বাদশার পালা, (৪) এরৎ বাদশার পালা, (৫) তাইজুল বাদশার পালা, (৬) তারা ডাকাইতের পালা ও (৭) জামাল বাদশার পালা। তবে 'ফোকরে পালা' দিয়ে গাজীর গান শুরু করার হয়। এই ফোকরে পালায় গাজী-কালুর ফকির হওয়ার কাহিনী পরিবেশন করা হয়। ফোকরে পালা শেষে অন্যান্য পালা পরিবেশনার বিধান প্রচলিত। গাজী কথাবার্তায় কাজে-কর্মে নিষ্ঠাবান হলেও কালু অসংযত। গাজীর গানের রস সৃষ্টিকারী চরিত্র মূলত এই কালু। সে-ই সাধারণত উল্টাপাল্টা কথাবার্তা এবং কাজের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদান করতে করতে গভীর ও করুণ কাহিনীর অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। এবারে গাজীর গানের ফোকরে পালা থেকে কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি করছি।

ছুকরী নৃত্যের পর মূল গায়েন উঠে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলে নেন-

: আমার বাড়ি হোলো দুধসর। ভাটই বাজারের পাশে। আমি হয়তো গান শুনায়ে আপনাদের ...মন ছুঁয়ানের যোগ্যতা আমার হইনি। আমি অল্প বয়াসে গান শিকেছি। হয়তো আপনারা উপভোগ করলি...আমি গাতি পারবানে। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয় তে মাপ করবেন। আর এক দ্যাশের বুলি আরেক দ্যাশের গালি। হয়তো গানের একই সুর সব জাগা এক না। এক এক জাগা এক এক সুরি গান করে।

গাজীর গানের শ্লীল-অশ্লীলতার ব্যাখ্যা আমার মনে হতে থাকে। মূল গায়েনের এই কথাতেই আছে : 'এক দ্যাশের বুলি আরেক দ্যাশের গালি। হয়তো গানের একই সুর সব জাগা এক না। এক এক জাগা এক এক সুরি গান করে।' শুধু এই বাক্যটি মেনে নিলে গাজীর গান সম্পর্কে সাধারণের অভিযোগ উঠে যাবে। স্থান বিশেষে অবস্থানহেতু মানুষের রুচির ভিন্নতা গাজীর গানের গায়েন ভালোভাবেই জানেন-তথাকথিত শিক্ষিতজনের জানা-বোঝার শক্তি নেই অথবা সাহস নেই। ধন্য তাই বাংলার গায়েনকুল, প্রণাম তাদেরই পায়ে।

মূল গায়েনের কথা শেষে যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হয়। তারপর ফোকরে পালার আখ্যানে প্রবেশক একটি ধুয়া। মূল গায়েন ধুয়াটিতে টান দিতেই এই ধুয়াটি চলে যায় দোহারদের মুখে–

আরে ও দয়াল হায়রে ওলি।
তুমি আল্লা তুমি নুরি
তোমা হইতে আদ্য তৈরি॥
তুমি আল্লা আদমের কাণ্ডার।

এবারে এই ধুয়াযুক্ত গানের মাধ্যমে মূলগায়েন গাজী-কালুর ফোকরে পালার মূল আখ্যানের সূচনা করেন। শুরুতেই মূলগায়েন

ঝিনাইদহ জেলার বাদুগড়াছি গ্রামে গাজী -কালু-চম্পাবতীর মাজারে উপস্থিত গাজীর গানর শিল্পী ও ছুকরি

গাজীর ফকির হবার সঙ্গী হিসেবে কালুকে আসরে জাগিয়ে তুলতে পরম আকুতির সাথে গেয়ে চলেন–

গাজী বলে ওগো ভাই
কালাচানের বাড়ি যায়–
ওরে আল্লার নামে ফকির হয়ে যাই
ওরে ভাই...

এই গান শেষে একজন কৌতুককারী উঠে এসে মূলগায়েনের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

: হ্যাঙ্গা-হোঙ্গি চেঙ্গাচেঙ্গি করলে, কি দিয়ে কি করলে ভাই, আমি তো কিছুই বুঝতি পারলাম না।

: তুমি বুঝতি পারলে না?
: না তো ভাই
: এই জায়গা এক লাখ আশি হাজার প্রতিমা বন্দনা করলাম...
: ভাই আপনার মাতাডা গোল না ব্যাঁকা?
: কেনো?

মূলগায়েনের এই প্রশ্নে গাজীরগানের আসরের রঙতামাশার চরিত্রটি এবারে অন্য রসিকতা করে–

: এক বদনায় কোন হালে এক লাখ আশি হাজার পুরে কোন্‌দে দেবে?
: কি পুরবো, কোথায়?
: এই বদনার ভিতরে এক লাখ আশি হাজার প্রতিমা...
: ওরে তা নয়, যাকে বলে বন্দনা, সেই বন্দনা করলাম।
: ওই বন্দনা করলি ছন্দনা করতি হয়, উচ্চ স্বরে গন্দনা করতি হয়, উর্ধ্বে পরমানিক ধরে পাম করতি হয়...

(এবারে সে আসরের সামনে পোতা গাজীর আশা দেখিয়ে প্রশ্ন করে)

তা ভাই তিন ফাঁক ইডা কি গাড়া ভাই?
: ইডা কি চিনলে না তুমি?
: না ভাই
: ইডা আমার গাজীপীরির আস্তানা
: ওই ভাই কি বিয়াদপ মানুষ কন্ দেকি
: কেন?
: তুমার মনে হচ্চে ইট্টু কাজানে দোষ...
: কি আমার কাজানে রোগ?
: হ' হ' লাগাও কুইনাইন চার পাঁচটা
: কুইনাইন কেন?
: তুমার গাজীপীরির কালা জ্বর আসতি পারে।
: ও বুলি শোনো, ইডা আমার গাজীপীরির হাতের আশা
: ওই গোলগাল দুটো ফাশা - ঘাড় ধরে মারলাম ঠাশা
: ঠাশা মারবে কেন?
: ফাশা দেখলাম কেন ভাই?
: ফাশা দেখলেই ঠাশা মারবে?
: যেনে পাবো ফাশা সেনে মারবো ঠাশা
: ও বুলি, ইডা কোনো হাটের মেয়েছেলে নয় ... ইডা হচ্ছে পীরির জায়গা...
: (গাজীর আশাতে ঝোলানো চামর দেখিয়ে চামরের কেশে হাত দিয়ে) ওই বিটা পীরির কোনোদিন ল্যাজ হয়ে থাকে ... তাও তো চারডে টানে ছিড়ে ফেললাম...
: বুলি ইডা ল্যাজ, কিন্তুক যাকে বলে বনগরু, ইডা কোনো শহুরে গরুর ল্যাজ নয়...
: ভাল কতা কয়চো ...(দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে) আপনেরাই কন্ ইডা বিয়াদপ লোক না ভাই?
: কেন?
: শ্বশুর মুরব্বি মানুষ আয়চে বেড়াতি, তার পাচার ল্যাজ কাটে নিয়ে তুমি রঙ করচো- তুমার কি কোনো আক্কেল আছে?
: বুলি ইডা শহুরে গরুর ল্যাজ না- যাকে বলে বনগরুর ল্যাজ।
: বুন! (বোন-এর ঝিনাইদহ অঞ্চলের উচ্চারণ বুন) বুন কয়ডা বসিয়ে খাতি (খেতে) দেচ্চো ভাই, যে বওনা'র (ভগ্নিপতির) পাচার ল্যাজ কা'টে রোঙ করচো... তার কর্মরুজি সবই বন্ধ করেচো... এত ভাতের মানুষ তুমি হয়েছো ভাই!
: (গাজীর আশাতে ঝোলানো চামরটি এবারে মূলগায়েন ভক্তি-ভাবে নিজের হাতে তুলে নিতে নিতে বলে) এ বওনা'র পাচার ল্যাজ না।
: তবে?
: এইডা আমার হাতের শেষ সম্বল চামর।

এবারে সহযোগী কৌতুককারী গায়েন গাজীর আশাতে ঝোলানো তসবি দেখিয়ে মূলগায়েনকে তার নতুন প্রশ্ন করে–

: ইডা কি?
: ইডা চিনলে না?
: না তো ভাই
: ইডা হচ্চে কুদরতি মালা...
: থু (থুথু ফেলে), আচ্চা বিয়াদপ মানুষ তো আপনে...! কোনতে কুকুরির পাচার (পাছা বা পায়ু'র) ময়লা টা'নে তুলে আ'নেচো!

: হোর বিয়াদপ একে বলে খোদার তসবি

: আর কতকাল ঘষবি

: ঘষতি হয় না, ইডা দিয়ে নামাজের সুরা-কালাম তেলাওয়াত করে... এতে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

: বহুতদিন মনের বাসনা চোকি (চোখে) নিয়ে ঘুরতিছি। ওই ভাই কি যে কয় তা কেমনে কি করলি বুঝা যায়। দেকি ভাইর কাছেই শুনি, এই ভাই তা কি করলি মনের বাসনা খাটে ভাই?

: কি করলি কি খাটে?

: হায় ভাই।

: তোমার মনের বাসনা- আমার পীরির আশীর্বাদে পূর্ণ হয়

: ভাই বহুত দিন বাসনা কোচে করে নিয়ে বেড়াচ্চি... খাটানের জা'গা পাইনে ভাই...

কৌতুককারী সহযোগী গায়েন মূলগায়েনের কাছে এসে নিজের পরিবর্তে মূলগায়েনের গলায় ফকিরি বস্ত্র তুলে দিতে যায়। এসময় মূলগায়েন তাকে বাঁধা দিয়ে বলে–

: ওরে আমার গলায় না

: তুমি তো নিজেই বলচো গলায় দিয়ে দয়াল মুর্শিদের নাম বলতে হবে... আমি তো তুমার গলায় বস্ত্র দিচ্চি...

: আমারে না, সে তুমার নিজের গলায় দিতে হবে...

: ও নিজের গলায়, অ্যা?

বস্ত্রটা সে মাথায় তুলে নেয়। মূলগায়েন তখন তাকে বাঁধা দিয়ে প্রশ্ন করে–

: কোনে দিচ্ছিস?

: নিজের গলায়।

শেষ পর্যন্ত তার ফকিরি বস্ত্র ধারণ সম্ভব হয়ে ওঠে, মূলগায়েন তখন তাকে গাজীপীরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলে তাকে আসরের সামনে পোতা গাজীপীরের আশাকে সালাম করতে বলেন। সে কথামতো গাজীর আশাকে সালাম দিতে যেয়ে সে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। তার প্রশ্ন একটাই সে কোনদিক হয়ে গাজীর আশাকে সালাম করবে? যে বিপাকে পড়ে সে রেগে যায়-

: হো'র মিয়া তুমার দরগার মুখ কোমনি গো?

: তুমার মুখ কোমনি?

: আমার মুখ যেমনিই হোক-তাই বুলে পীরমুকো পুঙা দিলি দোষ, দর্শকমুকো পুঙা দিলি দোষ-আমি কোন দিকে যাই গো?

মূলগায়েন এবারে তার একটি আক্ষেপ ছুড়ে দিল। সহযোগী অভিনেতা বা গয়েন এবারে মূলগায়েনকে ভক্তিরসের গানের প্রবেশের পথ করে দিল বুকের গভীর থেকে একটি প্রশ্ন বাক্য উচ্চারণ করে–

: আর কেমুন ভাব ভাই?

গাজী বলছে-

: কোথায় বানিয়াছ? কোথায় বানিয়াছ?

আল্লা বলে-

: হিদা তুমি আমার পানে চাও। এখনই শাহ গাজী সম্মুখেতে যাও।

ফকির হবার আগে গাজীর জাহিরীর পরীক্ষা নিচ্ছে কালুর চরিত্রাবিনেতা

বাদ্য বেজে ওঠে-যেন কেউ শূন্য থেকে আগমন করল-আর প্রশ্ন উচ্চারিত হলো-

: কে তুমি বানিয়ান বানিয়ান বলে ডাকছ?

: আমি ডাকিছি-বাবা তুমি কে?

: আমি বানিয়ান বৃত্তি করি।

: ও আমি তোমাকেই ডাকছি বাবা।

: আমাকে ইট্টু কাজ-কাম দিতে হবে।

: কাজ-কাম তুমি কী করিবে?

: আমি আল্লার নামে ফকির হয়ে যাবো।

: আল্লার নামে ফকির হবে বাপ-তোমার পরনে দেখছি কী?

: রাজ পুশাক।

: ওই রাজ পুশাক পরিত্যাগ করতে হবে-নবীর হাল খিলকা গলে দিতে হবে। খড়ম পায়ে দিতে হবে আর মাথায় টুপি দিতে হবে। তবেই তোমাকে চারটি নাম অর্পণ করে যাবো-

: তবে এই দুনিয়ার আমি কি কার্য করতে পারবো?

: তুমি নির্ধনকে ধন দিতে পারবে, অন্ধ চোখকে ভাল করতে পারবে, পুরতে পারবে মনস্কাম, মরা বৃক্ষ বাঁচাইতে পারবে কর্ণে দিয়া আল্লা- রসুলের নাম।

ওগো তুমি নির্ধনকে ধন দিতে পারো, কানা চক্ষু ভালো করতে পারো আর মরা বৃক্ষ বাঁচাইতে পারো কর্ণে দিয়া আমার আল্লা-রসুলের নাম। গাজী বলছে-

: বাবা আমি একা পীর হবো না। আমার সঙ্গে একজন সাথী দরকার।

: একা তো ফকিরি কাজ হয় না বাবা-তোমার সঙ্গে দোসর প্রয়োজন আছে।

: আমার সঙ্গে সাথী ছাড়া আমি কখখনো ফকির হয়ে যাবো না।

: আমার মাথায় দেখছো কী?

: লাল পাগড়ি।

: এই লাল পাগড়ির ভিতরে কেশ কালো আছে। এই কেশে কালাচান পয়দা হবে-তুমি প্রাণের ভাই কালাচান বলে ডেকে নাও-।

: ডাকলে পাবে তো?

: সত্যই পাবে-

গাজী বলছে-

: ও ভাই কালাচান, আরে ও ভাই কালাচান!

: আরে ওভাবে না, ওভাবে না, মহব্বতের সঙ্গে ডাকতি হোবি-

: মহব্বতের সাথে!

আসরে মাঝখানে মন্দিরা হাতে একজন ছুকরি তখন বলে উঠল–

: মানে অন্তরে অন্তরে-

মূলগায়েন এবারে কালুকে হৃদয় থেকে ডাক দেবার একটি গানে ঢুকে পড়লেন।

এমুন সুমায় দয়াল মুর্শিদ গাজী আমার এমুনভাবে ওই কালাচানকে ডাকছে-। একবার দুইবার তিনবারের মাথায় কালাচান আমার কেমুন সুরে উত্তর দিচ্ছে। গাজী ডাকছে-

: ও ভাই কালাচান

: (একটু আগে গাওয়া গানকে উপহাস করে সে গানের সুর নকল করে কালু গলা ভাঙা সুরে উল্টর করে।) কেনরে মিয়া ভাই-আয়-আয় আমার

: ও ভাই কালাচান, তুমি এমন করলে কেন, তুমার কি হোলো বলো তো?

: খেমটা তালের রাগিণী হোলোরে মিয়াভাই।

: খেমটা তালের রাগিণী! এমন সুন্দর রাগ তুমি জানো!

: ওরে আল্লা রাগের বাকশোর মুদি কোনে বসে রইচি, মিয়া ভাই কিচ্চু জানে না

: আচ্চা, তুমি রাগিণীটা আবার বলো তো

: রাগিনী শোনবেন, তা'লি শোনেন, ইকান থিকে মারলাম তীর লাগল কলাগাচে রক্ত প'লো তার আর বুড়োর চোক গেল

: ধোর বিয়াদ্দপ, ইডা কোনো রাগিণী হো'লো!

: রাগিণী হয়নি মানে!

: ওরে মিলির কতা ক'

: তা'লি মিলির কতা শোনো,– ক' যিন গাবগাচ

: আচ্চা ক'লাম গাবগাচ

: তুমার বাপ আমার বউ

: ধোর বিয়াদ্দপ

: আরে বাপরে রা'কে কতা কয়চো? আমি একুন ছাড়বো ক্যা?

: না ভাই, আজ তুমার ওই বদ রাগিণী শোনবো না।

: তা'লি?

: তা'লি পারে ও ভাই তোরে ইট্টু পরখ করে নিই, বল– ফকির ফকির কয় জাতের হয়?

: ফকিরির কয় জাত তুমি জানো?

: আমি জানি চার জাত।

: কেমুন চার জাত?

: আল্লার জাত, মুহাম্মদের জাত, শাক নষ্ট করার জাত আর ছেদাড়ে জাত।

: আল্লার জাত কেমুন?

: ওই নামাজ রাখো, রুজা পড়, পরকালে আছাড়ি পাওয়া যাবি ভাই।

: ধোর বিয়াদ্দপ, আছাড়ি না আসান পাবি?

: ওরে আছাড়িই পায়, যার নিয়াত ঠিক নাই।

: মুহাম্মদের জাত কেমুন?

: মুহাম্মদের জাত তুমার মতোন–পশ্চিম

মাঠে দরগা পা'তে বসে উ' উ' ক'রে ফু দেয়।

: কিন্তুক নও ছেদাড়ের জাত কেমুন?

: বাড়ি ছেলে পেলে আচে তো?

: দু'ডে এট্টা আচে।

: এমুন ফকির ঢাকার টাউনি অনেক হয়চে।

: কেমুন?

: জুয়ানমদ্দো সা'জে তো ভিক্ষে দেয় না, চাচীরা তাই ছেলে সাতে করে নিয়ে যায়, কয় যে, ছাতা বাড়ির মুদ জন্মাচ্চে, কোলে ইট্টু ফুটা ছেলে দেকে মায়ার খাতিরি ভিক্ষে দেয়।

: আর শাক নষ্ট করার জাতটা কেমুন?

: কবো নারে...

: ক'বা না ক্যানে?

: আমার মতোন

: ও তুমার মতোন

: হয় রে, সে এক বাড়ি নিউটন মার্কা খেচড়ি পা'য়া দিলাম টান, রাতির বেলা আমাবস্যা হল তাড়াতাড়ি বাইরি বারা'য়া দিলাম শাগের ক্ষেতে হাগে, আমাবস্যা হচলো তো...

: আমাবস্যা না আমশা

: হয়

: কিন্তুক নিউটন মার্কা খেচড়ি মানে?

: ওরে বুঝলি না, ভারতের বুটির ডাল আর বাংলাদেশের চাল এক বলে নিউটন মার্কা খেচড়ি ভাই

: কালাচান আমরা এমন ফকির হবো না।

: কেমুন ফকির হবো?

: আল্লার নামে হবো ফকির... কিন্তুক মায়ের কাচে বিদায় নিতে হবে, এইভাবে গেলে তো মা বিদায় করবে না ভাই... বুলি তুমি আমাকে ফকির সাজিয়ে দ্যাও।

গাজীর কথা মতো কালাচান গাজীকে সাজিয়ে দিতে দিতে বলে–

: অল্প বয়াসে কাজের ভয়তি হচ্চে ফকির। ইয়া আল্লা দেকে রাকো গো... এই নিজি হাতে সাজায়ে দিলাম আমি, রূপ ভাড়িয়ে মা'র কাচে দেকাবা তুমি।

কালাচানের সাজিয়ে দেওয়া নিজের ভাড়ানো রূপ দেখে গাজী মুগ্ধ হয়ে যায়– 'বাহ'।

এই কালাচান আমার গাজীর মন মতো সাজায়ে দিয়ে বলচে– মিয়া ভাই তুমার সাজিয়ে দিলাম আমি আর রূপ ভাড়ায়ে মাজননীকে দেখাবে তুমি– জিন্দাপীর গাজী যখন আল্লা বুলে গায় ফু নিয়েচে– এখুন রূপ ভাড়ায়ে কেমুন সুন্দর হয়েচে...

: ও মিয়া ভাই!

কালাচান রূপ ভড়ানো গাজীকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায় এবং সেই বিস্ময় থেকে বড় ভাই গাজীকে সে এক বদনা পানি এগিয়ে দিয়ে রঙ্গ করে-

: ও বিয়াই, হাত-মুখ ধোও

: ধোর বিয়াদ্‌দপ, তুমি কাকে পানি দিচ্ছো?

: কেন? তুমি ভাবীর চাচাতো বাপ না?

গাজী এখন কালুকে সাজাতে উদ্যত হয়। এসময়ে বাদ্যযন্ত্রে সুর ওঠে- 'মিলন হবে কতদিনে... আমার মনের মানুষের সনে...'।

গাজী একটি সাদা টুপি কালুর মাথায় দিতে

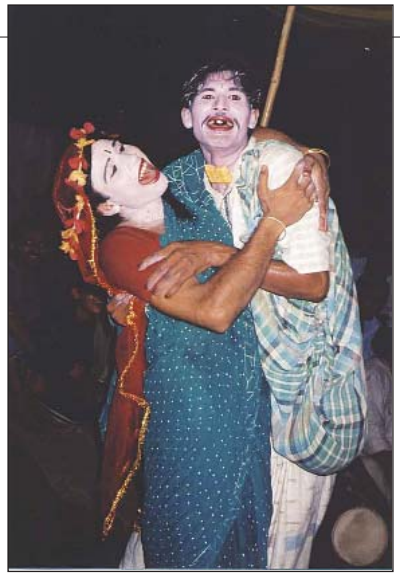

দাসীর সঙ্গে কালাচানের রঙ্গ- ছকরি রবিউল ও কালু চরিত্র হবিবর

গেলে কালু একটি আঙ্গুল খাড়া করে ধরে- এতে গাজী কথা বলে ওঠে-

: মাথা দ্যাও...

: এটাও মাথা।

: এটাও মাথা! ও মুনি মানুষের মাথা কয়টা?

: মাথা মানুষের তেইশটা।

: আমি দেখি একটা... তুমি তেইশটা মাথা পেলে কোথায়?

সে সময় আসরে বসা ছুকরীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে আর কালু সেই সূত্রে তাদের ইঙ্গিত করে বলে-

: এই ছেড়ি তুই হাসিসনে ফেক ফেক করে... তোর নাই দুডো বেশি হোতি পারে...!

গাজীর গানের মধ্যে কালাচান কথা বলে প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তার দৃঢ়তা ঘোষণা করে–

: তোমার কাছে জবান আমি নিয়েই ছাড়বোন আজকে....

গাজী চরিত্রে মূলগায়েন এবারে গানের মধ্যে কালুর প্রশ্নের উত্তর করতে থাকে :

ও মস্তক হইতে-এ-এ আছে কালাচান গো
ও ভাই বিনা দুধের দই।
দন্ত হইতে আছে কালাচান গো
ও ভাই বিনা ধানেই খই।

: ও ভাই হালকা কিছু বুঝলাম-আর ইট্টু বুঝতি বাকি থাকলো-

: আচ্ছা, তুমার এখনউ বুঝা হয়নি

: ওরে কবোল তো শুরু-আসর গুজা গুজিনি তো ভাই-পরের বাড়ি গেলি ডাল পাবো না-লাথি পাবো ইট্টু দেকতি হোবে না।

: ও তুমি তো আচ্ছা ফকির দেখছি।

: ও চাচীরা (ছুকরীদেরকে ইঙ্গিত করে) আমার সঙ্গে ইট্টু দুয়ারকি করো গো-ওর সাথে পারে দিচ্চি নে-(মূলগায়েন উচ্চতায় একটু ছোট তাই তাকে ইঙ্গিত করে) বাড়ে মানুষ তো বেরেন ইট্টু বেশি-

(কালাচান এবারে গানে গানে ধাঁধাময় প্রশ্ন করতে শুরু করে)

ও শালী হি হি হি।
শালার পো হট্ট বাঁধাইছি।
ওরে গাছের মাথার লাঠি ঝোলে
কোন বাবাজী?
ওরে তাইরে নাইরে না।

: শোন কালাচান তোরে বলি
ইহার মানে আমি জানি
গাছের মাথার লাঠি ঝোলে
সজনে বাবাজী।
ওরে তাইরে নাইরে না।

: শালী হি হি হি।
শালার পো হট্ট বাঁধাইছি।
ওরে খেচা দিলে বমি করে
কোন বাবাজী?

: শোন কালাচান তোরে বলি
ইহার মানে আমি জানি
খেচা দিলে বমি করে
টিবওয়েল বাবাজী।

ওরে দেল কোরান খুলে দেখো- ইমানদার হয়েচে ফকির। ওরে ইমানদার দুইটি পুত্রছিল- ও ভাই নামে গাজী-কালু। দুইটি ভাই আমার গেছে মায়ের দেউড়িতে- অন্তঃপুরে ছিল মাতা- মা তখন দাসীরে কি বলছে?

মূলগায়েনের এই বর্ণনায় এতক্ষণ আসরের মাঝে দোহারদলে বসে থাকা ছুকরি দুজন উঠে দাঁড়িয়ে অভিনয় শুরু করে–

: কোথায় গো মা প্রাণদাসী?

: হ্যাঁ মা-জননী বল না কেন?

: কোথা থেকে এসেচে ফকির। দিয়েছে জিকির। আমার হৃদয় যাচ্চে ফেটে। বল তো দাসী-আমার বুকে ওই জিকির লাগচে কেন এসে?

: মা গো, না জানি কোন বাদশার ছেলে অল্প বয়সে ফকির হয়ে এসেছে দুয়ারে।

: দাসীরে তুমি আমার প্রাণে চাও-আর কিঞ্চিৎ ভিক্ষা নিয়ে ওই ফকিরদের দাও

: মা কি কি ভিক্ষা নিয়ে যাবো?

: দাসীরে তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে?

: হ্যাঁ সত্যই।

: দাসীরে সোয়া সের আতপ চাল, পাঁচটি সুবর্ণ কড়ি আর একজোড়া ধৌতবস্ত্র দিলাম আমি তোমাকে আর এই নিয়ে যাবে তুমি ফকিরদের কাচে।

: ঠিক আচে।

: দাসীরে যাবে কিন্তু হাসিতে খেলিতে-

: ঠিক আচে তাই হবে মা...

দাসী ভিক্ষা দিতে এগিয়ে আসতে থাকলে কালু মৃদুস্বরে রঙ্গরসের দু'একটি গান গেয়ে ওঠে–

'আরে নারী তুমার খামচো দেবে রাস্তায় বেরোলি। সাবধানে থাকো নারী পর্দার আড়ালে।' এবং 'ও দাইমা কিচুই ভাল লাগে না। দাইমা গো...।'

ভিক্ষা দিতে দাসী যখন দুয়ারে পৌঁছে যায়, তখন কালু তার সাথে অনেক রঙ্গরসিকতা করে। যার মধ্যে পিছনের বাদ্যে বাজে একটি পরিচিত সুর–'আমি স্বপ্নে দেখলাম মধুমালার মুখও রে...।' তাদের সে রসিকতার মধ্যে গাজী এগিয়ে এসে বলে–

: দাসী আমরা ভিক্ষা নিবার ফকির না।

: ভিক্ষা না নিলি আমাকে মা বলতি হোবি।

: কালাচান দাসী বলচে ভিক্ষা না নিলি এই হতভাগা দাসীকে মা বলতি হবে?

: দাসীকে? বেশরম দাসী লোকের মা কয় কোনে যে, তুমি দাসীকে মা ক'তি কচ্চো!

: আমি না দাসী বলচে।

: ও আচ্চা।

: দাসী তুমি ঘরে ফিরে যাও, মাজননীকে কও দু'টি ভাই মায়ের সাক্ষাৎ আজি চাই।

: তা'লি আমার কিছু বর-দুয়া দ্যাও।

: (কালু এগিয়ে গিয়ে) কিরে বর চাস?

: ওরে কালু বর নয়, আশির্বাদ

: মানে আশি হাত।

: ওরে কালু তা নয়, আমরা যে মায়ের দুয়ারে এসেচি।

দাসী বাড়ির ভিতর ফিরে গিয়ে মাকে ডাক দেয়–

: কোথায় গো মাজননী?

: কি বলচো দাসী?

: ফকিরেরা তোমায় গো মা প্রণাম জানায়। আজকে তারা দুই ভাইয়ে তোমার সাক্ষাৎ চায়।

: দাসীরে আমি এখনই যাচ্চি।

দাসীকে সঙ্গে করে মাজননী একটি গান গাইতে গাইতে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং দাসীকে বলে–

: দাসীরে এইখানে থাকো তুমি। আজ কেমুনরূপ ফকির এসেচে একবার দেখে আসি আমি।

বাড়ির দরজায় দুই ভাই তখন অস্থির–

: কালাচান!

: ওরে ভাই!

: ওরে ভাই বড় সর্বনাশ হয়চেভাই, আমাদের সাক্ষাতে আমাদের সেই মাজননী চলে আসচে।

: ভাই গো, যদি মাজননী চলেই আসে তা'লি চল আমরা দুটো ভাই পালিয়ে চোরের মতোন চলে যাই।

: কালাচান, আমরা আল্লার নামে ফকির হোবো, পালিয়ে কেন যাবো ভাই, মায়ের কাচে সত্য পরিচয় দিতে হবে, যদি মায়ের কাচে না বলে যাই আল্লার গৎব পাবো, আর সালাম করে গেলে বেহশতবাসী হবো।

: তবে চলো ওই জননীমায়ের কাচে আমরা শেষ মিনতি জানিয়ে বলি, ওগো মা...

: কালাচান আমি সালাম করার পরে তুই মাকে সালাম করবি।

: ঠিক আচে ভাই আমি পরেই করচি। (দর্শকদের দিকে দুই হাত তুলে সালাম দিয়ে।) ভাই সগোল সালাম, ভাই সগোল সালাম গো...

এমুন সময় মাজননী এসে হাজির হলে শাহ

মায়ের মায়া তেকে গাজীকে টেনে নিয়ে যেতে চায়ছেন কালু চরিত্র হবিবর

গাজী সালাম দিল–

: মা, ওগো মাজননী, আমার দুইটি ভাইর সালাম গ্রহণ কর মা।

এমন সময় গাজী কালু মায়ের কাচে সত্য পরিচয় দিয়ে বলে–

: মাগো আমরাই তুমার দুটি ছেলে গাজী আর কালু

: এই বেশ তুমরা পেলে কোথায়, কে দিল?

: আমি সাজাইচি মিয়া ভাইর, মিয়া ভাই আমার।

: আমরা নিজি নিজিই নিয়েচি। এই বেশ আমাদের কেই দেয় নি।

: এখুন তুমরা এই ফকিরের বেশ খুলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

মা তাদের চিনতে পেরে শুধু তার প্রাণ আকুল করা কথা বলেই ক্ষ্যান্ত হয় না, মা তার সন্তানদেরকে আগলে রাখতে গান গেয়ে ওঠে–

: আরে তোমরা দুই ভাই আমার প্রাণ বাবারে
ও ফকির হয়ো না।
ও বাবা খোল খোল ফকিরের বেশ
ও ফকির হবো না।
আমার ঘরেতে আলো থাকবে না।

: মাগো তুমি কাঁদলে আমরা দুটি ভাই তুমায় ছেড়ে কেমুন করে ফকির হয়ে যাবো জননী?

: আমি তোদের দুটি ভাইকে বিদায় করে কেমুন করে ঘরে থাকবো?

: ওরে ভাই কালাচান সর্বনাশ হয়েচে, ওরে মা যে আমার চিনতে পেরে বিদায় করচে না! এখন উপায় কি করি!

: উপায় একটাই আচে মিয়া ভাই, তুমি কি পারবা জননী মাকে ফাঁকি দিতে?

: ও ভাই কালাচান, মাজননী কাঁদচে তাকে আমি কেমুন করে ফাঁকি দেবো?

: দেখ মিয়া ভাই, মাকে তুমি বল– ছোটবেলায় পাঠশালাতে যেভাবে খেলা শিখেছিলাম, মা যদি খেলা দেখতে চায় খেলা দেখাবো আর যদি খেলা শুনতে চাই মাকে আমি খেলা শুনাবো।

: ওমা, মা রে...

: বাবা রে...

: তুমি কি সত্যই দুটি ভাইর বিদায় করবে না মা?

: বাবা রে, আমার কণ্ঠে প্রাণ থাকতে আমি যে তোদের দুটি ভাইকে বিদায় করতে পারবো না।

: মাগো আমরা ছোট্টবেলায় স্কুলে গিয়েছিলাম যে খেলা খেলেছিলাম সেই খেলা আজ তুমি দেখবে না শুনবে?

: ওরে বাবা দেখতে পারলে আবার খেলা শুনতে শুনতে যাবে কে?

: মাগো তাহলে সাতপল্ল কাপুড় দিয়ে তোমার চক্ষু বাঁধতে হবে, তবেই তোমাকে খেলা দেখাবো আমরা।

: বাবা রে তোমাদের কতামত সত্যই সাতপল্ল কাপুড় দিয়ে চক্ষুবন্ধন করচি বাবা।

: ভাই কালাচান, মার চক্ষুবন্ধন হয়েচে, তুমি এবার কাল নিদ্রাকে ডেকে দাও।

গাজীর কথামত কালাচান আসরের মাঝখানে যন্ত্রীদলের দিকে তাকিয়ে কালনিদ্রাকে ডাক দেয়। যন্ত্রীদলের মধ্যে থেকে অন্য ছুকরিটি উঠে তখন কালনিদ্রার অভিনয় করে–

: ওগো ওগো আলসীনিদ্রা কালনিদ্রা...

: বল গো বল।

: একবার আমার জননীর চোখি যাও না।

: যেতে পারলাম না।

: কেন?

: তুমার মায়ের চোখি পাওয়ার কম।

: বলি তোর পুঙায় তিনখানা দাদ রে। ঘিন্না করিনে আমরা আমরা দুই ভাইরে। আমার মার চোখি কম তে হয়চ কি? (কালনিদ্রাকে লাঠি দেখিয়ে মারতে উদ্যত হয়ে) এই গেলি...

: তবে যাচ্চি

: যাবি তো বটেই... মিয়া ভাই ওই তো মা ঘুমা গেচে, চল দুটি ভাই পালিয়ে যাই।

: আমি মাকে একবার শেষবারের মতোন জনম ভ'রে মা বলে ডেকে যাবো। মা'র সাতে এই জনমে তো আর দেখা হবে না।

এমুন সুময় শাহ গাজী আমার কেমুনভাবে যেয়ে মা জননীর পদতলে যেয়ে ডাকচে, কেমুনভাবে?

: মা, ও জননী মা, মা গো, তোমার দুটি সন্তানচলে যাচ্ছি-

মা গো তুমি একবার নয়ন মেলে চেয়ে দেখো জননী একবার...

গা তোলো গা তোলো মাগো
ওমা নয়ন মেলে চেয়ে দেখো
গাজী কালু ফকির হোলো
গা তোলো গা তোলো ॥

: (মায়ের পা আগলে থাকা গাজীর আকুল করা গানের মধ্যে কালু গাজীর সঙ্গে অনবরত ফকির হবার কথা বলতে থাকে।) মিয়া ভাই, বেলা বয়ে যায়, চলো দুই ভাই নবীনগর পার হয়ে ফকির হয়ে যাই।

: ওরে কালাচান তুমি চলে যাও-আমি এই

জননী মাকে ছেড়ে আর কোনোদিন তুমার সঙ্গে ফকির হবো না।

: (হাতে তালি দিয়ে) বাহ-বাহ-বাহ। মিয়াভাই তুমি ধনসম্পত্তির লোভে চোখের অশ্রু জল ছেড়ে দিচ্চো-তুমি কি জানো না একদিন নিমাই ফকির হয়ে গিছলো ঘরের বিষ্ণুবধূ রেখে-

: কালাচান-ওরে আমি ধনসম্পত্তির লোভে ফকির না হয়ে থাকতি চাচ্চি নে ভাই...

: তবে কিসের জন্যি কানছো ভাই?

: আমি কানছি আমার জনম দুঃখিনী মায়ের জন্যি।

: আমি বুঝতে পারছি ভাই-। আপন মাকে পর কর পরের মাকে আপন কর। তার পরেরই তোমার ওই শিরোমণি ধর্ম হবে ভাই-

: কালাচান তুমি চলে যাও, আমি মাকে ফেলে কোনোদিন যাবো না।

: আমি তুমাকে বেন্দে নিয়ে যাবো ভাই, ছেড়ে দিয়ে যাবো না। আমি বলেছিলাম ভাই আমার ফকির হওয়ার সাধ ছিল না... আমি তুমার কোনো কথাই শুনতে চাই না। তুমাকে যেতেই হবে...

দর্শকদের ভিতর থেকে একটি গামছা নিয়ে কালাচান মায়ের মায়ায় পড়া গাজীর দুটি হাত বেঁধে নিয়ে টানতে থাকে। আর গাজী অনবরত মায়ের দিকে ঝুঁকে থাকে–

: আমার এই মা জননীকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? এমন জননী মা আমি কোথায় পাবো?

: ভাই গো আপন মাকে পর কর আর পরের মাকে আপন কর, বারবার বলছি।

এপর্যায়ে গাজী গান ধরে–

: ও আমার মা'র কথা ভুলবো কেমনে?
মায়ের কথা মনে হলে কালাচান
নয়ন জলে ভাসে
কেমুন করে যাবো কালাচান
সেই মা'র দিয়ে ফাঁকি।

গান শেষে গাজী একই আবেগে কথা বলে ওঠে–

: কালাচান আমি এইভাবে যদি চলে যাই সারা জীবন মা আমার ঘুমায়ে থাকপি কোনোদিন মা জননী ঘোম থেকে জাগবে না।

: মিয়া ভাই, জননী মাকে আমরা ঘোম ভাঙায়ে দিয়েই দুটো ভাই চলে যাবো...

: মার চোখের থেকে চল সোনা বুড়িকে ডেকে মার চোখের থেকে কালনিদ্রাকে তুলে দিই।

: ঠিক আচে তা-ই চল যাই, সোনাবুড়ির কাচে যেয়ে কালনিদ্রা আলসী নিদ্রাকে বলবো– ওগো আলসী নিদ্রা কালনিদ্রা তুমরা একবার এসে আমার মা জননীর চক্ষু থেকে নিদ্রা তুলে দাও গো...

যে সুময় ওই মা'র চোখের থেকে কালনিদ্রা সরে গেচে অমনি মা ঘোম ভেঙে দেখে সামনে তার ছেলে দুটো নাই–'ওরে হায়!' বলে মা তখুন কাঁনতে শুরু করে।

: কেমুনভাবে কাঁনদে ভাই?

: ও নিশি প্রভাতকালে দাসী আমি কার-বা বাড়ি যাবো, ওরে চোখের মনি বলে ওরে আমি কারে কোলে নিবো?

আমার সোনার পালঙ্ক রইল খালি
ও গুপালরে আমার।
বাবারে... কোন-বা পথে যাবো রে
ওরে কোন-বা পথে গেছে রে আমার গাজী-কালু...

দাসীরে এইখানে আমাকে বসিয়ে থুয়ে গাজী আর কালাচান কোন পথে গেচে তুই কি বলতে পারিস?

: না মা আমি তো তাদের সন্ধান জানি না।

: তাহলে এই নগর মাঝারে একবার ঘুরে এসা আমার সেই দুটো গুপাল কোথায় আছে? দেখে এসো।

: মা এইখানে থাকো তুমি আর ওই জঙ্গল মাঝে খুঁজতে যাবো আমি...
কোথায় গো নগরবাসী?

: বল বল

: গাজী আর কালাচানকে দেখেচো?

: না গো না।

: দাসী আমার সেই গুপালকে পেয়েচিস?

: মাগো নগরে নগরে করিলাম ভ্রমণ। কোথাও না পেলাম গাজী-কালুর দর্শন।

: কোথাও পেলি না, দাসীরে তাহলে কি আমার সেই দুটি গুপালকে কোনোদিনও আর পাবো না।

: ওরা ওই জঙ্গলে চলে গেচে...

দাসীর কথায় মা জননী এবার গানে গানে কান্নায় ভেঙে পড়ে-

: আহা দাসী সর্বনাশীরে কী কথা শুনালি
নগরে নগরে দাসীরে করিলি ভ্রমণ
কোথাও না পেলি দাসীরে গাজী কালুর দর্শন।

এতদিন কার কলিজার টুকরারে দাসী গেল যে কোথায়

দুই ভাই ততক্ষণে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। 'জঙ্গলে তারা কেমুনভাবে যাচ্চে গো?' -'ওরে দয়াল গাজী আগেতে চলে। পিছে চলে কালু।' এখানে এসেই ফোকরে পালা শেষ হয়।

এইভাবে গাজীর গানের প্রতিটি আসরে এখনো ফোকরে পালার শেষ করে মূলগায়েন দর্শকদের কাছে শুনে নেয়– দর্শকরা সে-রাতে গাজীর গানের কোন পালা শুনতে চায়। কেননা, উপস্থিত ভক্তদের রসবোধ না বুঝে পালাগান করা গর্ধবের কর্ম।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন গাজীর গানের অস্তিত্ব নিয়ে শেষ কথা যায় কি-না, আর 'বর্তমানে এ গানের প্রচলন নেই বললেই চলে।' এ কথাটাও কি মেনে নেওয়া যায়। 'বাংলাপিডিয়া'র মতো একটি জাতীয় কোষগ্রন্থ এদেশের জনপ্রিয় একটি পরিবেশনারীতি গাজীর গান অন্তর্ভুক্তিটি এরপর নিশ্চয় শুধরে নিবেন। এই আমাদের প্রত্যাশা হোক।

নতুন পদ্ধতিতে ভাগ্য গণনা

আপনার ভবিষ্যত সম্পর্কে সঠিক পূর্ভাভাস পেতে হলে অথবা সঠিক গ্রহ রত্ন (১০০% হালাল) ধারণ করতে হলে আজই পরামর্শ নিন।

হস্তরেখা ও জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্র

৩১২, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫। (নিউমার্কেট থানার পার্শ্বে)।
মোবা: ০১৮৯-৪৪৪০২০ (টি & টি), ০১৭৬-৬০৮০৮২।
বি: দ্র: ঈদ উপলক্ষ্যে ৫০% ছাড় পেতে বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনুন।

তোমার কাছেই মিনতি
শুধু তোমার কাছেই
বন্ধ করো না সব কটা দরজা
ফিরে আসিবার দাও মোরে।
শুধু জেনো
সব তোমারই জন্য। -**OK2**

প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

যাকাতের শাড়ি, লুঙ্গি কিনুন

যাকাতের একটি শাড়ি বা লুঙ্গির জন্য গরিব লোকেরা সারা বছর রমজান মাসের অপেক্ষায় থাকে। আপনি একটি পোশাক যাকাত দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন ও দোয়া পেতে পারেন। বাংলাদেশে গরিবদের মাঝে যাকাত দেয়ার জন্য আমাদের শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি বা শিশুদের পোশাক কিনুন। আপনি চাইলে, আপনার নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেব অথবা আমরা নিজেরাও বিতরণ করে দিতে পারব।

দাম/মূল্য পরিশোধ/পদ্ধতি ইত্যাদি জানতে রমজানের মধ্যেই যোগাযোগ করুন। রাসেল ট্রেডার্স
মোবাইল : ৮৮-০১৯১৩৯২৩৫২, ই- মেইল : russel_1996@yahoo.com
ফ্যাক্স : ০০৮৮০২-৯০০৪১৩৬